শতবর্ষের পথে

গৃহদাহ

সম্পাদনা

বর্ণালি হাজরা

SATABARSER PATHE GRIHADAHA, Critical discussion on bengali novel Grihadaha, Edited by Dr. Barnali Hazra, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700009, December : 2018. ₹ 160.00

© লেখক

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ২০১৮

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণ সংস্থাপন
ছায়া গ্রাফিক্স
কলকাতা : ৭০০০৫৪

মুদ্রক
স্টার লাইন
কলকাতা : ৭০০০০৬

ISBN : 978-93-86508-79-9

মূল্য : একশো ষাট টাকা

সূচিপত্র

বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র	৯	বর্ণালি হাজরা
বাংলা কথাসাহিত্যে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র	১৬	শাশ্বতী চক্রবর্তী
বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস : প্রসঙ্গ 'গৃহদাহ'	২৮	তন্দ্রা পাল
শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' : ইঙ্গিতবহ নামকরণের সার্থকতা	৩৭	জয়দেব মণ্ডল
'গৃহদাহ' : ত্রিকোণ প্রেম-সমস্যা	৪৩	অমর পাত্র
'গৃহদাহ' : ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব	৫১	লিপিকা ঘোষাল
'গৃহদাহ' উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য	৫৭	পম্পা মুখোপাধ্যায়
'গৃহদাহ' উপন্যাসের অভিনবত্ব	৬৬	কোয়েল দত্ত
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের গঠনশৈলী	৭২	রাজেশচন্দ্র মণ্ডল
'গৃহদাহ' উপন্যাসের ভাষাশৈলী	৭৭	শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
'গৃহদাহ' : উপন্যাস-পরিণতির শিল্প সার্থকতা	৮৯	মিষ্টু রায় সামন্ত
মহিম : প্রেমের অধিকার বঞ্চিত এক সুভদ্র চরিত্র	৯৫	সুদীপা চৌধুরী
'গৃহদাহ' উপন্যাসের সুরেশ ও তার চাওয়া-পাওয়া	১০৪	রেণুকা মাজী
নায়িকা অচলা	১১২	মঞ্জরিতা চক্রবর্তী
শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নায়ক বিচার	১২১	বিমল কুমার থান্দার
অপ্রধান চরিত্রচিত্রণ	১২৭	নিবেদিতা সেন
'গৃহদাহ' উপন্যাসে মহিম ও সুরেশ চরিত্র : তুলনামূলক আলোচনা	১৩৬	আসরফী খাতুন
অচলা—মৃণাল একই সত্তার দুই অংশ	১৪৫	শ্রীপর্ণা দত্ত
অন্যান্য বাংলা উপন্যাস ও 'গৃহদাহ'	১৫১	গুরুপ্রসাদ দাস
এক নজরে শরৎচন্দ্রের জীবনপঞ্জি	১৫৭	
সময়ানুসারে শরৎচন্দ্রের রচনাপঞ্জি	১৫৯	

'গৃহদাহ' উপন্যাসের অভিনবত্ব

কোয়েল দত্ত

উন্মেচিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম উপন্যাস। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, বাস্তব-অবাস্তবের টানাপোড়েনে জীবন ও জগত যেমন প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে, তেমনই সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসও তার রঙ-রস-রূপকে পরিবর্তিত করতে থাকে। আর খুব নিশ্চিতভাবেই অতিক্রান্ত সময়ের সাথে ঔপন্যাসিকেরও ভাবনার রদবদল হতে থাকে। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসটি তার অন্যতম একটি দৃষ্টান্ত। এটা অনস্বীকার্য যে সমগ্র শরৎ সাহিত্যে 'গৃহদাহ' একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী উপন্যাস। এই উপন্যাসটি পাঠের পর প্রথমেই যেটি স্পষ্ট করে চোখে পড়ে, সেটি হল—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীর স্নেহশীলা জননীসুলভ কল্যাণী মূর্তির যে স্বাভাবিক প্রবাহ তার থেকে 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নায়িকা 'অচলা' মুক্ত। এছাড়াও উপন্যাসের পরিবেশ ও পরিস্থিতি নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি মূলতঃ একটি বিশেষ ধারাকেই ব্যবহার করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। সেইদিক থেকে বিচার করলে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে তিনি অনেকাংশেই নিজের ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ঘটনাগুলির মূল অভিমুখ নির্ণীত হয়েছে প্রায় সবটাই অচলাকে কেন্দ্র করে। 'অচলা'-ই এই উপন্যাসের সর্বস্ব। তাকে ঘিরেই আর সমস্ত চরিত্রের বিকাশ ও প্রকাশ। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'গৃহদাহ' নিশ্চিতভাবেই অভিনবত্বের দাবি করতে পারে।

সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে উপন্যাসের কাহিনিকে সাজিয়ে তুলতেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। সমকালীন সমাজজীবন তাঁর উপন্যাসের মূল উপজীব্য। জাতিভেদের গোঁড়ামি, কৌলীন্য প্রথা, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপকে ঘিরে যে একটি সমান্তরাল সমাজব্যবস্থা চলে আসছে তার স্বরূপ প্রকাশ, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, হিন্দু-ব্রাহ্ম সম্পর্ক, নারীর প্রণয়ের স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজের চাপিয়ে দেওয়া অনুশাসন তাঁর উপন্যাসের অন্যতম বিষয়। সামাজিক সমস্যাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে তাঁর ক্লান্তি নেই। কিন্তু সমস্যাগুলির সমাধানসূত্রে তিনি কিঞ্চিৎ নীরবতাই পালন করে এসেছেন। সমকালীন ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতও তাঁর উপন্যাসে কিছুটা ব্রাত্যই রয়ে গেছে। ব্যতিক্রম 'পথের দাবী'। সামান্য উল্লেখ আছে 'শেষ প্রশ্ন' ও 'বিপ্রদাস'-এ। মূলতঃ আমাদের আলোচিত এই বিষয়গুলি তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর উপন্যাসগুলির কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে প্রণয় সংক্রান্ত সমস্যা। প্রণয়ের তীব্রতাকে নৈতিকতার সঙ্গে সংযোগ সাধন করে প্রেমের একনিষ্ঠতার প্রতি তিনি প্রায়শই গুরুত্ব

আরোপ করেছেন। পরকীয়া প্রেম, বিধবার প্রেম এমনকি বারাঙ্গনার প্রণয়ের ক্ষেত্রেও তিনি কামনার তীব্রতা অপেক্ষা প্রণয়ের মাধুর্যের উপরই বেশি গুরত্ব দিয়েছেন।

আমরা যদি এখন আমাদের আলোচনার মূল পরিসরে প্রবেশ করি তাহলে দেখব উপন্যাসের কাহিনির দিক থেকে একজন বিবাহিতা নারীকে কেন্দ্র করে দুটি পুরুষের প্রণয় অভিঘাত বাংলা উপন্যাসে একেবারে দুর্লভ নয়। দেখবার দৃষ্টিভঙ্গিতে তফাৎ নিশ্চয়ই আছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। যেমন—বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বাল্যপ্রণয়ী প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর আকর্ষণের ফলে স্বামী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তার সম্পর্কের গ্রন্থিবন্ধন কখনই নিবিড় হয়ে উঠতে পারেনি। একদিকে যেমন চন্দ্রশেখরের সম্পর্ক নির্মাণে ঔদাসীন্য, অন্যদিকে শৈবলিনী-র হৃদয়ে প্রতাপের অস্তিত্ব। এই সংঘাত এবং সমাজনীতির অনুমোদনহীন প্রেম শৈবলিনীর মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে। স্রষ্টা বঙ্কিম শৈবলিনী-র প্রতি চরম নির্মমতা পোষণ করে তাকে নরক পর্যন্ত দর্শন করিয়েছেন। শেষপর্যন্ত দৈহিক শুচিতা অক্ষুণ্ণ থাকার সুবাদে স্বামীগৃহে শৈবলিনী মমতা ও আশ্রয় লাভ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এবং 'নষ্টনীড়' গল্পটিতে সম্পর্কের এই বিন্যাস এবং টানাপোড়েন আর একরকম ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। 'ঘরে বাইরে'-র বিমলা-র সংকট শৈবলিনী-র থেকে পৃথক। বিমলা-র জীবনে স্বামী নিখিলেশের সর্বব্যাপী একক উপস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে নিখিলেশ স্বয়ং—"আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকি আছে। .....এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না। কাকে পেয়েছ, তাও জান না। ....তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ছাঁচের মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকন্নাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমি হওনি, আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয়টা যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।"[১] নিখিলেশের আকাঙ্ক্ষা বাইরের জগতের একটি বিরাট প্রেক্ষিতের মাঝখানে যেন বিমলা তাকে সত্যস্বরূপে চিনে নিতে পারে। বাইরের জগতে বিমলার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে নিখিলেশের আত্মস্থ চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ 'মনোহরণ' কুশল স্বভাবে অভ্যস্ত সন্দীপের। বিমলা মুহূর্তেই মোহমুগ্ধ হয়েছে। তবে শেষপর্যন্ত সন্দীপের ছলনা ও সম্মোহন থেকে মুক্ত হয়েছে বিমলা। বিমলা আত্মশুদ্ধির আগুনে দগ্ধ হয়ে পুনরায় গৃহে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। দাঙ্গায় আক্রান্ত নিখিলেশের জীবন সংশয় দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি বিমলাকে এক চরম ট্র্যাজেডির সম্মুখীন করেছে।

'নষ্টনীড়' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ ভূপতির যন্ত্রণাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। চারুলতা ও অমলের সম্পর্কের স্বরূপ যে এইভাবে উদ্ভাসিত হতে পারে তা অজ্ঞাতই ছিল ভূপতির কাছে। বরং ভূপতি ভেবেছিল চারুকে সাহচর্য দেওয়ার জন্য অমল এবং মন্দাই যথেষ্ট। ভূপতি আধুনিক মানুষ। স্ত্রী-র উপর অধিকার জোর করে আদায় করতে নেই। এই ঔচিত্যবোধের আলোকে সে ভেবেছিল 'স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না। স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না।'[২]

আর এখানেই ভূপতির পরাজয়। তাই এই 'নষ্টনীড়'-এ স্বামী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও চারুলতা অমলের স্মৃতিকে সযত্নে লালন করে এসেছে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসের সমস্যা কিন্তু আলোচিত কাহিনিগুলির থেকে একটু জটিল। কারণ একই সময়ে অচলা দুটি পুরুষের প্রতিই আকর্ষণ বোধ করেছে। প্রেমিক মহিমের সঙ্গে সম্পর্ক নির্মাণের সূত্রপাতেই মহিমের বন্ধু সুরেশের অচলার জীবনে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। উদ্দাম সুরেশের আবেগের প্রাবল্য, অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠার প্রচণ্ডতা অচলাকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করলেও সে দ্রুতগতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে মহিমকে বিবাহ করেছে। এই উপন্যাসে অচলা চরিত্র নির্মাণে শরৎচন্দ্র নিশ্চিতভাবেই অভিনবত্বের দাবি রাখতে পারেন। সমগ্র শরৎ সাহিত্যে অচলা অদ্বিতীয়া। সুরেশ এবং মহিমের প্রতি তার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দোলাচলে নিশ্চিতভাবেই সে জটিল চরিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। অচলা তার জীবনে মহিম ও সুরেশের গুণকে একটি মানুষের মধ্যেই পেতে চেয়েছে। সেটি সম্ভব নয়। ফলতঃ সে কখনও মহিমের কখনও সুরেশের প্রতি আকর্ষণবোধ করেছে। অচলার আকর্ষণের সংকটটাই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। সুরেশ না মহিম অচলার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ কে? এই সর্বগ্রাসী প্রশ্নের কোনো সমাধান অচলার কাছে ছিল না।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীর সতীত্ব তথা নারীত্বের মহিমা বিশেষভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রাজলক্ষ্মী, অন্নদা দিদি, অভয়া, পার্বতী, সাবিত্রী, কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্রে নারীর প্রেমের অভীপ্সাকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তিনি যেমন অকুণ্ঠিত তেমনি সতীত্বের সংস্কারকে অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রেও একাগ্র। অসামাজিক নিষিদ্ধ প্রণয়ের পরিচয় তাঁর বহু উপন্যাসেই আমরা পাই। দৈহিক শুচিতার নৈতিক শৃঙ্খল থেকে প্রেমকে তিনি বহুক্ষেত্রেই মুক্তি দিতে চেয়েছেন। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র তাঁর প্রচলিত সতীত্বের সংস্কারকে একটি নতুন পরীক্ষায় ফেলেছেন। অচলার মানসিক দোলাচলতার প্রেক্ষাপটকে মূলধন করে তিনি তাঁর সামগ্রিক উপন্যাস সাহিত্যের নায়িকাদের প্রতি তুলনায় অচলাকে একটি ভিন্ন তাৎপর্যে ব্যক্ত করেছেন। এর পিছনে কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে উত্তরাধিকারসূত্রে তার পিতা কেদারবাবুর থেকে প্রাপ্ত অস্থিরচিত্ততা। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"আমরা তাঁর (কেদারবাবু) Silly ব্যবহারের পটভূমিতেই অচলার দোলাচলবৃত্তির প্রজন্মগত ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। মহিমের সঙ্গে অচলার বিয়ে কেদারবাবু ঠিক করেই ফেলেছিলেন। সুরেশের অকস্মাৎ প্রবেশ ও অকস্মাৎ 'ভাংচি'তেই একলহমায় কেদারবাবু মহিম সম্বন্ধে বলে বসলেন—'কে জানত সে এমন বিশ্বাসঘাতক, এমন মিথ্যাবাদী!'[৩] ধনী সুরেশের উপস্থিতি কেদারবাবুকে ঋণমুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তাই বাড়ির ছেলের মত সুরেশের উপস্থিতি তিনি কামনা করেছিলেন। কিন্তু সুরেশ যখন উপলব্ধি করেছে বিয়ের ক্ষেত্রে মহিমের দাবিই প্রবল তখন সে কেদারবাবুকে অর্থের খোঁটা দিয়ে অপমান করেছে। আর কেদারবাবুও আবার মহিমের সঙ্গে অচলার বিয়েতে রাজি হয়ে গেলেন। এই অস্থিরচিত্ত পিতার সন্তান হিসাবে অচলাকে স্থাপন করে শরৎচন্দ্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পাদন করতে পেরেছেন। মাতৃহীন একটি অসংগঠিত

পরিবারে বড় হয়ে উঠেছে অচলা। তাই অচলার সচেতন স্রষ্টা তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে মাতৃসুলভ—সাংসারিক জ্ঞান সমৃদ্ধ যে নারী চরিত্রের উপস্থাপন করেন, তার থেকে অচলাকে ভিন্নরূপে উপস্থাপিত করেছেন। খাদ্য, সেবা, সাংসারিক পটুত্ব কোনটি দিয়েই অচলা মহিম কিংবা সুরেশকে মুগ্ধ করেনি। মহিম ও অচলার প্রণয়ের বিস্তৃত বিবরণ এই উপন্যাসে নেই। হিন্দু মহিমের ব্রাহ্ম অচলার প্রতি প্রণয়ের কোনো পটভূমিকা শরৎচন্দ্র নির্মাণ করেননি।

সুরেশ ও মহিম দুই বন্ধু বটে, কিন্তু তাদের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। সুরেশের প্রতি তুলনায় মহিমের স্বভাবগত স্তিমিত রূপ অচলাকে সুরেশের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। তাই মহিমের অনুপস্থিতিতে সুরেশকে তাদের গৃহে আসার নিমন্ত্রণ জানাতে সে ভোলেনি। সুরেশের চরিত্রের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তার অধিকারবোধের প্রাবল্য। এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল সংযম ও ভারসাম্যের অভাব। হৃদয়াবেগের চাঞ্চল্যে সুরেশ বন্ধুকৃত্য পালনে উদ্দাম। মহিমকে ব্রাহ্ম বিবাহ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তার অচলার গৃহে আগমন। নাকি সুরেশকে ছাড়া মহিমের জীবনে নেওয়া এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে মেনে না নিতে পারার যন্ত্রণাই তাকে অচলার গৃহে আসতে বাধ্য করেছিল। ব্রাহ্মদের সম্পর্কে তীব্র বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও অচলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই সে বলেছে—'ব্রাহ্মদের ঘৃণা করি কি না, সে জবাব ব্রাহ্মদের দেব, কিন্তু আপনি আমার কাছে তাদের অনেক উপরে।' (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) সুরেশের চরিত্রের এই অসংযম ও অসঙ্গতির মেলবন্ধন অচলাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার লক্ষ্যে কেদারবাবুকে অর্থের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করায়, মহিমের নামে মিথ্যা রটনা রটায়, অচলাকেও তার স্বভাবের উদ্দামতায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। অচলাকে না পাওয়ার পরাজয় সে স্বীকার করতে পারেনি। বরং অচলাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার আরো উদগ্র হয়ে উঠেছে। বিনা আমন্ত্রণেই সে পৌঁছে গেছে অচলা ও মহিমের বিয়ের পর মহিমের গ্রামের বাড়িতে। সুরেশ চরিত্রের ভারসাম্যের অভাব পুনরায় প্রকট হয়ে উঠেছে। গ্রামের বাড়িতে মহিমের নিষ্ক্রিয় আবেগবর্জিত চরিত্রের পরিচয় পেয়ে মানসিকভাবে দুর্বল, দ্বিধান্বিত অচলা স্বামীর প্রতি বীতরাগ হয়ে সুরেশকে আশ্রয় করতে চেয়েছে।

এরপরই ঘটেছে উপন্যাসে গৃহদাহের ঘটনা। এই অগ্নিসংযোগের পিছনে কে বা কারা দায়ি সেই বিষয়ে শরৎচন্দ্র আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত দেননি। তবে সন্দেহের তালিকায় গ্রামের ধর্মধ্বজীরা যেমন আছেন, তেমনি সুরেশও সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। অচলা ও মহিমের নববিবাহিত জীবনের এই চরম বিপর্যয়ে মহিমের নীরব শীতল আচরণ এবং অচলার সংস্কারাচ্ছন্ন, দোলাচলচিত্ততা তাকে সুরেশের সঙ্গে গৃহত্যাগ করতে সহায়তা করেছে। অগ্নিকাণ্ডের জন্য সুরেশকে সন্দেহ করেও সে সুরেশের সঙ্গে কলকাতায় বাপের বাড়িতে ফিরে গেছে। সুরেশের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় এবং মহিমের এই দাম্পত্য সম্পর্ককে লালন করার ক্ষেত্রে অসীম নিস্পৃহতা সুরেশের ভারসাম্যহীন উদগ্র চাহিদাকেই পরিপুষ্টি দান করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মৃণালের উপস্থিতি। অচলার চরিত্রের বিপরীতে মৃণালের অবস্থান। শরৎচন্দ্রের আদর্শ নারীর মডেল স্বরূপ মৃণালের উপস্থিতি। সামাজিক প্রেক্ষিত নির্মাণের উদ্দেশ্যে মৃণাল একটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে এইসঙ্গে এটাও স্বীকার্য মহিম-অচলা-সুরেশের সম্পর্কের জটিলতার মাঝখানে মৃণালের

গুরুত্বকে তিনি অনেক সময়ই উচ্চকিত করে ফেলেছেন। অচলার চরিত্র নির্মাণে দুঃসাহসী হতে গিয়েও শরৎচন্দ্র তাঁর অন্তরস্থিত নারীমূর্তির প্রতি দুর্বলতাকে দূর করতে পারেননি। হয়তো সেই কারণেই মৃণালের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট। মহিম ও অচলার দাম্পত্য জীবন যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারল না তার একটি কারণ মৃণাল। মহিম ও মৃণালের সম্পর্ক অচলার কাছে স্পষ্ট নয়। এই সম্পর্ক সম্পর্কে মহিমের নীরবতা মহিম সম্পর্কে অচলার বিকর্ষণকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। শহুরে, শিক্ষিতা, ব্রাহ্ম অচলার সঙ্গে মৃণালের রুচি ও রসিকতার তফাৎ আমাদের চোখে পড়েছে। যা অচলাকে শ্বশুরবাড়ির এই গ্রাম্য জীবনে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে। অচলা ও মহিম তাদের হঠকারী বিবাহের সিদ্ধান্তের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞই ছিল। তাদের প্রণয়ের প্রেক্ষাপটও যেহেতু স্পট নয় সেহেতু অচলা কেন এই সম্পূর্ণ অপরিচিত, অস্বচ্ছন্দ পরিবেশে থাকবে তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য লেখক উপস্থাপিত করেননি। এরপর অগ্নিকাণ্ড একটি ইঙ্গিত মাত্র। ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল অচলার গৃহত্যাগের জন্য। সুরেশের প্রতি তার এই আকর্ষণ বিকর্ষণের খেলা চলতেই থেকেছে। মহিমের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও মহিমের শারীরিক অসুস্থতার কারণে পশ্চিমে হাওয়া বদলের সময় সুরেশ অযাচিত ভাবে সঙ্গী হওয়ায় সে খুশি হয়। ট্রেনের সহযাত্রিণীর প্রশ্নের উত্তরে সে সুরেশকে তার স্বামী হিসেবে পরিচয় করায়। এরপর ঘটনার স্রোতে অসুস্থ মহিমকে ফেলে ট্রেন বদলের মধ্য দিয়ে ডিহরিতে গিয়ে পৌঁছায়। ডিহরিতে সুরেশের অসুস্থতার কারণে ট্রেনের ওই সহযাত্রিণীর বাড়িতেই তারা স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে ওঠে। সুরেশের সঙ্গে অচলা রাত্রিবাস করেও মহিম যে তার স্বামী একথা ভুলতে পারেনি। তাই শেষপর্যন্ত অচলা ও সুরেশের সম্পর্কে আকর্ষণ অন্তর্হিত হয়ে বিকর্ষণটুকুই থেকে গেছে। দাম্পত্য সম্পর্কের এই মিথ্যা অভিনয় করতে করতে ক্লান্ত সুরেশের এখানেই সাক্ষাৎ ঘটে মহিমের সঙ্গে। মহিমের উপস্থিতি আত্মবিশ্লেষণের আগুনে দগ্ধ সুরেশের আত্মোপলব্ধি ঘটায়। পরিণামে প্লেগের সেবা করার নামে সুরেশ এক প্রকার আত্মহত্যাই করেছে। মহিম মৃত্যুপথযাত্রী সুরেশের কাছে শুনেছে—'অচলা যে তোমাকে কত ভালোবাসত, সে আমিও বুঝিনি, তুমি বোঝনি—ও নিজেও বুঝতে পারেনি। সেটা তোমার দারিদ্র্যের সঙ্গে এমনি ঘুলিয়ে উঠল যে—যাক! এমন সুন্দর জিনিসটি মাটি করে ফেললুম—না পেলুম নিজে, না পেতে দিলুম অপরকে। কিন্তু কি আর করা যাবে!' (৪২ পরিচ্ছেদ) যদিও এই ভালোবাসার স্বরূপ জানার পরও মহিমের মনে অচলার প্রতি কোনো অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে কি না তা শরৎচন্দ্র প্রকাশ করেননি। বরং অচলার আগামী জীবনের নিঃসীম শূন্যতাকেই তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন—'সেখানে ভয় নাই, ভাবনা নাই, কামনা নাই, কল্পনা নাই—যতদূর দেখা যায় ভবিষ্যতের আকাশ ধূ ধূ করিতেছে। তাহার রঙ নাই, মূর্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই—একেবারে নির্বিকার, একেবারে একান্ত শূন্য।' (৪৩ পরিচ্ছেদ)

ব্রাহ্ম ও হিন্দু সংস্কারের যে একটি সংঘাত এই উপন্যাসকে ঘিরে ছিল তার চরম প্রতিক্রিয়াটি ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসের শেষে। সুরেশের মৃত্যুর পর গৃহত্যাগিনী অচলাকে মৃণাল সতীধর্মের পাঠ দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছে। ব্রাহ্মধর্মের বিপ্রতীপে হিন্দু মৃণালের পতিভক্তি, সতীত্বের সংস্কার, সেবাপরায়ণতা, কল্যাণী মূর্তি সনাতন হিন্দু সংস্কারের আলোকে

অচলাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছে। যা হয়ত লেখকের নিজেরই ব্রাহ্ম সংস্কারের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবনারই প্রতিফলন। তবে এটা শরৎচন্দ্র স্পষ্ট করে তুলেছেন মহিমের হাত ধরে অচলা বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিলেও, সেই হাতের মধ্যে প্রতারিত স্বামীর প্রেমের স্পর্শ থাকবে না। এটাই অচলার ভবিতব্য।

আলোচনার শেষে একটা কথার পুনরুক্তি করা যেতেই পারে—'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের ব্যতিক্রমী উপন্যাস। প্রধানত অচলাকে কেন্দ্র করেই তার নির্মাণ। প্রেমের একনিষ্ঠতার প্রতি, নারীত্বের মহিমার প্রতি তাঁর সযত্নলালিত বিশ্বাসকে তিনি নিজের কাছেই নিজেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন অচলাকে গড়ে তোলার জন্য। অচলার দ্বারাই এই উপন্যাসের সবটুকু নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অচলার বেড়ে ওঠা, তার দ্বিধা, মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার দুর্বলতা নিয়ে অচলা রক্তমাংসের এক সজীব মূর্তিতে প্রকাশিত। অচলার যন্ত্রণা ভালোবাসার যন্ত্রণা নয়, ভালোবাসতে না পারার যন্ত্রণা। সে সুরেশকেও ভালোবাসেনি, মহিমও তার প্রণয়ী নয়। এই প্রেমহীনতার সংকটই তাকে দগ্ধ করেছে। তাই সুরেশের মৃত্যুতেও সে যেমন নির্বিকার তেমনি মহিমের সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার আশ্বাসেও সে নিশ্চুপ। বেঁচে থাকার গ্লানিটুকু তাকে বেঁচে থেকে ভোগ করতে হবে এই ভাবনাতেই উপন্যাস শেষ করেছেন শরৎচন্দ্র। এখানেই উপন্যাসের অভিনবত্ব।

উল্লেখ সূত্র

১. 'ঘরে বাইরে', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র, ২য় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃ. ৯১
২. 'নষ্টনীড়', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০২, পৃ. ৪১৭-৪১৮
৩. 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৯৫, পৃ. ১৯১

সহায়ক গ্রন্থ

১. 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৯৫
২. 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' (৩য় খণ্ড), ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০০৯
৩. 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা', সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০০
৪. 'বাংলা উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা', জয়ন্তকুমার ঘোষাল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯২

লেখক পরিচিতি : কোয়েল দত্ত—অধ্যাপক, পি.ডি. উইমেন্স কলেজ, জলপাইগুড়ি।